بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৩ জুলাই, ২০২৬ মোতাবেক ০৩ ওয়াফা, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ-মমতা ও দানশীলতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, তাঁর (আ.) দান ছিল এক সীমাহীন সমুদ্র এবং তাঁর হাত ছিল মুক্তা বর্ষণকারী মেঘের মতো। তা বর্ষিত হতো এবং তৃষ্ণা নিবারণ করত, আর রমযান মাসে এর মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেত। আর অতি গোপনে হুযূর (আ.) অভাবগ্রস্তদের দান করতে থাকতেন, আর অত্যন্ত মূল্যবান সব বস্তুও অন্যকে দিয়ে দিতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর জীবনের সব পর্যায়েই এই অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যাদিষ্ট হওয়া ও দাবির আগেও এটি আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল ছিল। মিয়াঁ গাফফারা সাহেব তথা আব্দুল গাফফার কাশ্মীরী, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুগ্রহ এবং মানবিকতার কথা উল্লেখ করে নিজ বিবৃতিতে বলেন, যখন তার বিয়ে হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে সাহায্য করার জন্য দুটি মূল্যবান অলঙ্কার দিয়েছিলেন। এটি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হবার পূর্বেকার কথা, যখন তিনি নিভৃতচারী হিসেবে জীবনযাপন করতেন।

হযরত শেখ সাহেব লেখেন, এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এমন কোনো পরিস্থিতি তাঁর সামনে আসে নি যখন তাঁর (আ.) কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি তা দেন নি, অথবা তিনি কারো প্রয়োজন উপলব্ধি করে তার চাওয়া বা আবেদন ছাড়াই তাকে সাহায্য করেন নি। তিনি ছিলেন পরম মার্গের দানশীল।

হযরত বশীর ভাট্টি সাহেবের মাতা বর্ণনা করেন, একবার আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ (রা.)-র বিয়ের সময় এক গায়িকা নারী ঢোল নিয়ে হুযূরের বাড়িতে চলে আসে এবং তা বাজাতে শুরু করে। এটি করে সে (টাকাপয়সা) কিছু পেতে চাইছিল, কারণ এটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে সাধারণত এই রীতি প্রচলিত ছিল। হুযূর যখন ঢোলের শব্দ শোনেন, সাথে সাথে সেদিকে মনোযোগী হন এবং বলেন, তাকে বলো– সে যেন এটি না বাজায় এবং তা বন্ধ করাও; আর সে যা চায় তাকে দিয়ে দাও। অতঃপর তাকে চার-পাঁচ রুপি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সে বলতে থাকে, শীতকাল চলে এসেছে এবং আমার শীত লাগে; তখন তিনি তাকে একটি লেপও পাইয়ে দেন, কিন্তু ঢোল বাজানো বন্ধ করিয়ে দেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত, তাঁর (আ.) কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকের প্রতি শখ ছিল না। জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁর কাছে উপহারস্বরূপ অনেক সাধারণ ও সেলাই করা পোশাক আসত, বিশেষ করে কোট, ওয়েস্টকোট এবং পায়জামা-পাঞ্জাবি ইত্যাদি। এগুলো সাধারণত লাহোর নিবাসী শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব প্রত্যেক ঈদ এবং কুরবানীর ঈদের সময় সাথে করে উপহার হিসেবে নিয়ে আসতেন, তিনি (আ.) সেগুলোই ব্যবহার করতেন। তবে এসবের বাইরে মাঝে মাঝে তিনি নিজেও পোশাক বানিয়ে নিতেন। পাগড়ি তো সাধারণত

তিনি নিজেই কিনে বাঁধতেন। যেভাবে পোশাক বানানো হতো এবং ব্যবহৃত হতো, ঠিক তেমনি সাথে সাথে তা খরচও হয়ে যেত; অর্থাৎ তাবাররুক (বা পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন) হিসেবে লোকেরা সব সময়ই তা চাইতে থাকত। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতিও তৈরি হতো যে, তিনি একটি কাপড় তাবাররুক হিসেবে কাউকে দিয়ে দিলে, সাথে সাথে অন্য একটি বানিয়ে তা পরতে হতো। আর কিছু বুদ্ধিমান লোক এমনটিও করত যে, উদাহরণস্বরূপ– নিজের একটি কাপড় পাঠিয়ে দিল এবং সাথে নিবেদন করল, হুযূর, আপনার পরিহিত কাপড়টি তাবাররুক হিসেবে দিয়ে দিন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেছিলেন, আমার কাছে একটি ছোটো আকারের পবিত্র কুরআন ছিল, *অর্থাৎ একটি ছোটো কুরআন শরীফ ছিল*, যার হরফগুলোও অনেক স্পষ্ট ছিল এবং সেটি আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু এক ব্যক্তি সেটি চায়, তখন আমি তাকে সেটি দিয়ে দিই যেন তার চাওয়া প্রত্যাখ্যাত না হয়।

হযরত কুরাইশী শেখ মুহাম্মদ সাহেব– যিনি ডাকপিয়ন ছিলেন এবং কাদিয়ানের বাসিন্দা ছিলেন– তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বিতরণের জন্য অনেকগুলো মানি অর্ডার নিয়ে যাই এবং হুযূরকে তাঁর মানি অর্ডারের টাকা বুঝিয়ে দেবার পর শহরে বিলির কাজ করতে থাকি। যখন চারটার দিকে ডাকঘরে ফিরে আসি এবং পোস্টমাস্টারকে বিলি করা মানি অর্ডারের হিসাব দিতে যাই, তখন হিসাব করে দেখি, ভুলবশত আমি কোথাও ছয় রুপি বেশি দিয়ে দিয়েছি। এতে আমি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ি, কারণ হুযূরকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটিই ছিল একটি বড়ো অঙ্ক। তাই আল্লাহ্ দিত্তা নামের সেই পোস্টমাস্টার– যে একজন ধর্মান্ধ অআহমদী ছিল– সে বলে, সবচেয়ে ভালো হয় তুমি গিয়ে মির্যা সাহেবের কাছ থেকে জেনে আসো। আমার মন যদিও চাচ্ছিল না যে, আমি আবার গিয়ে হুযূরকে কষ্ট দিই, কিন্তু তার বারংবার পীড়াপীড়িতে আমি হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, হুযূর! আজ ভুলবশত আমি কোথাও ছয় রুপি বেশি দিয়ে দিয়েছি। হুযূর বলেন, মিয়াঁ! আমি তো জানিই না– কত টাকা গ্রহণ করা হয়েছিল! আর আমি তো এর মধ্য থেকে কিছু খরচও করে ফেলেছি, অর্থাৎ লোকদেরকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যাহোক, তুমি গরিব মানুষ, আমি তোমাকে এই টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। তবে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে কাজ করবে, কারণ তুমি গরিব। এই ঘটনা থেকে হুযূরের উত্তম চরিত্র, বদান্যতা এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত মীর মাহদী হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমার কাছে 'চশমায়ে মসীহী' পুস্তকের একটি কপি চান। আমি বলি, হযরত সাহেব (আ.) বলেছেন, দপ্তরে এতগুলো কপি থাকা উচিত, কারণ মাঝে মাঝে সরকার তলব করে বা যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে তার কপিগুলো চেয়ে পাঠায়। তাই এখন আপনাকে দেবার মতো আর কোনো অতিরিক্ত কপি নেই। আপনি হযরত সাহেবের (আ.) কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে পারেন। তখন মৌলভী সাহেব হুযূরের সমীপে পত্র লেখেন। সে চিঠির সারমর্ম এরূপ ছিল– দপ্তরে 'চশমায়ে মসীহী'র মাত্র বিশটি কপি অবশিষ্ট আছে এবং আমার একটি কপির প্রয়োজন। যদি কোনো অসুবিধা না হয় তবে আমাকে একটি কপি দেওয়া হোক। হুযূর (আ.) বলেন, আপনি একটি কপি নিয়ে নিন। এরপর তিনি সেই চিঠির ওপরেই তা লিখে স্বাক্ষর করে দেন। এতে যেমন সাহাবীদের

স্পষ্টবাদিতারও পরিচয় পাওয়া যায়– কীভাবে তিনি (রা.) পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, এতগুলো কপি আছে এবং আমার একটি প্রয়োজন, আর দপ্তর থেকে এই কথা বলছে; তবে হুযূর যদি দয়াপরবশ হন তবে যেন দেওয়া হয়– এটি ছিল তার স্পষ্টবাদিতা। পাশাপাশি এখানে হুযূর (আ.)-এর অনুগ্রহেরও পরিচয় পাওয়া যায় যে, যদিও তা সংরক্ষিত বা রিজার্ভ হিসেবে রাখা ছিল, যে-কোনো সময় প্রয়োজন পড়তে পারত, কিন্তু তিনি আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন নি।

হযরত আকদাসের (আ.) কাছে মাঝে মাঝে পণ্ডিত মোহন লাল, যে সেই সময় এক বুদ্ধিমান যুবক ছিল, লেখরাম সাহেবের কোনো চিরকুট ইত্যাদি নিয়ে যেত। যেহেতু হযরত আকদাসের পরিবারের সাথে মোহন লালের পুরনো সম্পর্ক ছিল, তাই হযরত আকদাস পণ্ডিত মোহন লাল সাহেব যখন যেত, তাকেও খালি হাতে ফিরতে দিতেন না। কিছু না কিছু উপহার অবশ্যই দিয়ে দিতেন, যেমন ফলমূল বা চিনি, যা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের হতো এবং সে যুগে এটি একটি বিশেষ উপহার হিসেবে গণ্য হতো। শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বলেন, পণ্ডিত মোহন লালের পরিবারের সাথে আমারও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তা তার বাবার যুগ থেকেই ছিল। সে আমার কাছে সেই দিনগুলোর ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে সবসময় বলত, হযরত সাহেব (আ.) অনেক অনুগ্রহ করতেন এবং সবসময় হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন, আর কখনও খালি হাতে ফিরতে দিতেন না। একবার হযরত সাহেব (আ.) আমাকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের আপেল দেন; আমি তা নিয়ে যাই। পণ্ডিত লেখরামেরও এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমি যখন ফিরে যেতাম সে অবশ্যই জিজ্ঞেস করত, কী এনেছ? আমি যখন বলি, আপেল এনেছি তখন সে অনেকটা লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, দাও দাও, আমিও খাই! পণ্ডিত মোহন লাল বলে, আমি হাসতে হাসতে তাকে বলি, শত্রুর বাড়ির জিনিস তোমার খাওয়া উচিত নয়। তুমি তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘোর শত্রু, (তাঁর বিরুদ্ধে) বিভিন্ন কথা বলো; তুমি কেন তাঁর বাড়ির জিনিস চাইছ? তখন সে চট করে আমার হাত থেকে আপেল নিয়ে নেয় এবং খেতে আরম্ভ করে দেয়। একপ্রকার ছিনিয়েই নেয় এবং খাওয়া শুরু করে দেয়। তিনি বর্ণনা করেন, মোটকথা, সে সবসময় হযরত সাহেবের (আ.) কাছ থেকে ভালোবাসা এবং মানবিকতাই দেখেছে।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূরের (আ.) কাছে কস্তুরী বা মৃগনাভি থাকত। একবার আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমার কস্তুরী প্রয়োজন। হুযূর পুরো কৌটাই আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এর থেকে যতটুকু চান নিয়ে নিন। আমি তা থেকে সামান্য একটু নিই। তিনি মুচকি হেসে বলেন, এটি তো কিছুই নয়; আর এরপর হুযূর নিজেই এক-দেড় তোলার মতো কস্তুরী আমাকে দিয়ে দেন। এটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু; কস্তুরী আজও মূল্যবান এবং ঔষধ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো বস্তুর মূল্যবান হবার প্রতি তাঁর (আ.) কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি তো কেবল নিজের মহানুভবতাই প্রদর্শন করেছেন।

বন্ধুদের প্রতি তাঁর (আ.) সমবেদনা ও বদান্যতার একটি ঘটনা হাকীম মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করে এবং এর সপ্তম দিন মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে তার অর্থাৎ স্ত্রীর মাঝে খিঁচুনির লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেহেতু সেই দিনগুলোতে এই মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই এর প্রতি অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, আমি মাগরিবের পর ছুটে হযরত

সাহেবের সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁর কাছে নিবেদন করি, আমার স্ত্রীর এই অবস্থা। তিনি (আ.) বলেন, **এটি তো এক মারাত্মক রোগের পূর্বাভাস। তুমি তাড়াতাড়ি তাকে দশ রতি হিং খাইয়ে দাও।** তিনি হিং-এর ঔষধের কথা বলে দেন এবং বলেন, এক-দেড় ঘণ্টা পর আমাকে সংবাদ জানাবে। আমি এশার পর আবার উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, রোগের প্রকোপ আরও বেড়ে গেছে। *কমার পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।* তখন তিনি (আ.) বলেন, দশ রতি কুইনাইন খাইয়ে দাও। এক ঘণ্টা পর আবার আমাকে অবহিত করবে। আর এটি মনে করবে না– আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কোনো দ্বিধা না করেই পুরুষদের (অংশের) সিঁড়ি থেকে আমাকে ডাক দেবে। এক ঘণ্টা পর আমি আবার যাই এবং নিবেদন করি, কোনো উপশম হয় নি। তখন তিনি (আ.) বলেন, দশ রতি কস্তুরী দিয়ে দাও। আমি নিবেদন করি, এ সময় কস্তুরী কোথায় পাবো? হুযূর (আ.) এক মুঠো কস্তুরী নিয়ে আসেন এবং বলেন, এখানে দশ রতি হবে। আমি নিবেদন করি, হুযূর, এখানে তো বেশি আছে! তিনি বলেন, নিয়ে যাও, পরে কাজে লাগবে। আমি তা নিয়ে নিই এবং দশ রতি রোগিণীকে সেবন করাই। এক ঘণ্টা পর আবার যাই এবং নিবেদন করি, রোগের প্রকোপ আরও বেড়েছে। তিনি বলেন, এখন দশ তোলা ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দাও। তিনি এভাবে বিভিন্ন ওষুধ পরিবর্তন করতে থাকেন। আমি ফিরে এসে দশ তোলা ক্যাস্টর অয়েল সেবন করাই। এর পর তার প্রচণ্ড বমি হয়, আর এই রোগে বমি হলো শেষ পর্যায়। বমির পর তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়, ঘাড় পেছনের দিকে বেঁকে যায়, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। আমি আবার ছুটে গিয়ে সিঁড়িতে উঠি। হুযূর (আ.) আমার ডাক শুনে দরজা খুলে দেন এবং বলেন, কী ব্যাপার, সব ঠিক আছে তো? আমি নিবেদন করি, এখন তো অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঘাড় বেঁকে গেছে, *এটি মেনিনজাইটিসের একটি লক্ষণ*, চোখে দৃষ্টি নেই, বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাগতিক যত অস্ত্র ছিল তা তো আমরা প্রয়োগ করেছি। এখন একটি মাত্র অস্ত্রই অবশিষ্ট আছে আর তা হলো দোয়া। তুমি যাও, আমি দোয়া থেকে তখনই মাথা তুলব যখন সে আরোগ্য লাভ করবে। *কী অপরিসীম স্নেহ তাঁর!* তিনি বলেন, আমি একথা শুনে ফিরে আসি এবং স্ত্রীকে বলি, এখন তোমার আর কীসের চিন্তা! এখন তো দায়িত্ব গ্রহণকারী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, তখন রাত দুটো বেজে গিয়েছিল। আমি বাড়িতে আসি এবং রোগিণীকে সেই অবস্থায় রেখেই অন্য একটি কক্ষে গিয়ে চারপাই বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমি এখন দোয়া করব। অতএব এখন আমার আর কোনো কাজ নেই। তিনি বলেন, সকালে কোনো বাসনের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। আমি তাকিয়ে দেখি, আমার পায়ের দিকে আমার স্ত্রী কিছু বাসনপত্র গোছাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, (এখন) কী অবস্থা? সে বলে, আপনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর দুঘণ্টা পরই আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি কৃপা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এই ঘটনায় বন্ধুদের প্রতি তাঁর সমবেদনা এবং বদান্যতা– দুটো ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) লেখেন, কাদিয়ানে নিহাল সিং নামের এক বেকুব বা নির্বোধ, অভদ্র ব্যক্তি ছিল। সে যৌবনকালে কোনো এক সেনাবাহিনীতে চাকরিও করত এবং পেনশন পেত। তার বাড়িটি জনাব খান বাহাদুর মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বৈঠকখানার ঠিক দেয়াল ঘেঁষে লাগানো ছিল। সে জামা'তের এক ঘোরতর শত্রু

ছিল। তারই প্ররোচনায় হযরত হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং অন্য কয়েকজন আহমদীর বিরুদ্ধে একটি জঘন্য, মিথ্যা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সে সবসময় অন্য লোকেদের সাথে মিলে আহমদীদের বিরক্ত করত এবং গালিগালাজ করা তার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় ছিল। ঠিক এই দিনগুলোতেই যখন মামলা চলছিল, তার ভাতিজা সান্তা সিংয়ের স্ত্রীর জন্য কস্তুরীর প্রয়োজন পড়ে। আর অন্য কোথাও থেকে যে শুধু কস্তুরী পাওয়া যাচ্ছিল না তা-ই নয়, বরং এটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তুও ছিল। সেই পরিস্থিতিতে সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দরজায় যায় এবং কস্তুরী চায়। *এ সেই ব্যক্তিই– যে ঘোর বিরোধী ছিল।* হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ডাক শুনে সাথে সাথেই বাইরে আসেন এবং তাকে সামান্যতমও অপেক্ষায় না রেখে তার আবেদন শোনামাত্র তিনি ভেতরে চলে যান এবং বলেন, দাঁড়াও, আমি এখনই নিয়ে আসছি। অতঃপর তিনি প্রায় আধা তোলার মতো কস্তুরী এনে তার হাতে তুলে দেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) লেখেন, যখন এই দেশে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ওহী এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি ওষুধ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। হুযূর (আ.) এর নাম রাখেন **'তিরইয়াক-এ-ইলাহী'**। আর এই ওষুধের কোনো নির্ধারিত ব্যবস্থাপত্র বা উপাদান-তালিকা ছিল না, বরং যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রচ্ছন্ন ওহী নির্দেশনা দিয়েছে, তিনি (আ.) সেভাবেই এর উপাদানগুলো সংগ্রহ ও ব্যবহার করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যার যে সাধারণ প্রচলিত রীতি রয়েছে, তার পরোয়া করতেন না। আর উপাদানসমূহের ওজন ও পরিমাপ সেই মূল ঐশী জ্ঞানের অধীনে পরিচালনা করতেন। *যেভাবে নির্দেশনা আসত, তিনি (আ.) ততটুকু পরিমাণই তাতে যুক্ত করতে থাকতেন।* এই ওষুধে কয়েক হাজার টাকার তো মণিমাণিক্যই দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক মূল্যবান ওষুধ মেশানো হয়েছিল। যখন এই ওষুধ তৈরি হয়ে যায়, তখন হুযূর (আ.) অত্যন্ত উদারতার সাথে তা বণ্টন করেন এবং কারো কাছ থেকে দানা বা বিন্দু পরিমাণও কিছু গ্রহণ করেন নি, কিছুই নেন নি। বরং বাইরে থেকে যারা চাইত, তাদেরকে নিজ খরচে পার্সেল রেজিস্ট্রি করে ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন। ডাক্তার সাদেক সাহেব একবার বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি দুই-তিন মাশা তিরইয়াকের জন্য আবেদন করেছিল, তিনি (আ.) তাকে অনেক বেশি পরিমাণে তা কৌটায় ভরে রেজিস্ট্রি করিয়ে পাঠিয়ে দেন। ইরফানী সাহেব লেখেন, আমিও নিবেদন করেছিলাম, তখন তিনি (আ.) আমাকেও অনেক পরিমাণে দান করেছিলেন। কেবল তিরইয়াক সম্পর্কেই হুযূরের (আ.) এমন আচরণ ছিল না, বরং ঔষধপত্রের বিষয়ে হুযূরের (আ.) আদর্শ এমন ছিল যে, অনেক সময় পুরো বোতলই দিয়ে দিতেন এবং কখনও কখনও তিনি (আ.) অত্যন্ত মূল্যবান ও উন্নত মানের কস্তুরী নিজের চরম শত্রুদেরও দিয়ে দিয়েছেন। যার মাঝে একটি ঘটনা এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত শেখ মুহাম্মদ নাসিম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমাদের কস্তুরীর প্রয়োজন হয়। কাদিয়ানে সে দিনগুলোতে এটি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। হযরত সাহেবের (আ.) কাছে চাইলে তিনি (আ.) প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দান করেন।

মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বর্ণনা করেন, এক বন্ধু অনেক পরিশ্রম, চেষ্টা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কোনো এক ব্যক্তির কাছ থেকে কুশতা-র (ভস্ম বা বিশেষ ইউনানী ওষুধ) একটি ব্যবস্থাপত্র বা ফর্মুলা সংগ্রহ করেন এবং কুশতা তৈরি করে হুযূরের (আ.) সমীপে পেশ করেন এবং ব্যবস্থাপত্রটিও দিয়ে দেন। অন্য এক বন্ধু আমাকে

বলেন, সেই ব্যবস্থাপত্রটি সংগ্রহ করা হোক। কিন্তু ওই বন্ধু কাউকে তা বলতেন না। আমি হযরত সাহেবের (আ.) কাছে যাই এবং নিবেদন করি, অমুক বন্ধু হুযূরকে কোনো কুশতা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, ওই যে শিশি রাখা আছে, ওটি নিয়ে নাও। আমি নিবেদন করি, এর ব্যবস্থাপত্র? হুযূর (আ.) বলেন, সেটিও ওখানে সাথেই রাখা আছে। সুতরাং সেই কুশতাটি ব্যবস্থাপত্রসহ আমি নিয়ে আসি এবং ওই বন্ধুকে দেখাই যে, দেখো! তুমি বলছিলে না; এই যে দেখো, আমি নিয়ে এসেছি! সে হুযূরের (আ.) কাছে গিয়ে বলে, হুযূর কি তা দিয়ে দিয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন, সে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। সে চাইতে এসেছিল, আমি দিয়ে দিয়েছি। তারপর হুযূর (আ.) আমাকে এ-ও বলেন যে, মির্যা সাহেবের *অর্থাৎ হুযূরের মরহুম পিতার* বায়ায (নোটবুক বা ফর্মুলার খাতা) আমার কাছে আছে। আপনার তো ব্যবস্থাপত্র চাই, তাই না? আমি আমার পিতার বায়ায আপনাকে দিচ্ছি, এতে অত্যন্ত চমৎকার সব ব্যবস্থাপত্র আছে, সেটিও আপনি নিয়ে নিন। এরপর আমার আর সেই বায়ায নেবার কথা মনে ছিল না, যদিও হুযূর (আ.) তা দান করতে চেয়েছিলেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) নিজের একটি চিঠিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে লেখেন, গর্ভাবস্থার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে আমার বাড়িতে এমন কষ্ট চলছে যে, বাড়িতে খাবার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। রুটি তন্দুরে বানিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তরকারির জন্য সমস্যা হচ্ছে। তাই আবেদন করছি, কিছুদিনের জন্য লঙ্গর থেকে তরকারি নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এর জবাবে হযরত আকদাস (আ.) লঙ্গরের ইনচার্জ মিয়াঁ নাজমুদ্দীন সাহেবকে লেখেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন, মুফতী সাহেবকে যেন লঙ্গর থেকে দুই বেলা উত্তম তরকারি দিয়ে দেওয়া হয় এবং এটি বিশেষ নির্দেশনা।

হযরত মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য নাসীবাইন-এ একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর ইচ্ছা করেন। এতে মির্যা খোদা বখশ সাহেব এবং মৌলভী কুতুবুদ্দীন সাহেব ছিলেন, আর তৃতীয় সদস্য আমার পিতা মিয়াঁ জামালুদ্দীন সাহেব ছিলেন। লটারির মাধ্যমে এরা সবাই নির্ধারিত হয়েছিলেন। হুযূর (আ.) কাপড় ইত্যাদি তৈরির জন্য তিনজনকেই মাথাপিছু পঞ্চাশ রুপি করে দেন এবং এরপর হুযূর (আ.) একটি বিদায়ী সভার আয়োজন করেন। যাহোক, পরবর্তীতে কিছু কারণবশত এই প্রতিনিধিদলের যাত্রা স্থগিত করতে হয়। তিনি বলেন, যখন প্রতিনিধিদলের যাত্রা স্থগিত হয়ে যায় তখন আমার পিতা সেই পঞ্চাশ রুপি হুযূরের (আ.) কাছে ফেরত দিতে যান। হুযূর (আ.) বলেন, আমরা যখন কাউকে কিছু দিয়ে দিই, তা আর ফেরত নিই না। যখন পিতা বাড়িতে ফিরে আসেন তখন এই ঘটনাটি তিনি আমাকেও শোনান।

হযরত মালিক গোলাম হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এটি ১৮৯৪ বা ১৮৯৫ সালের জলসা সালানার কথা। আর হুসামুদ্দীন সিয়ালকোটি সাহেব, যিনি রান্না করা এবং খাওয়ার বিষয়ে খুব শৌখিন ছিলেন, সেই সময় জলসায় এসেছিলেন। তিনি হযরত সাহেবের (আ.) সমীপে 'শব দেগ'-এর অনেক প্রশংসা করেন। তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! 'শব দেগ' অত্যন্ত সুস্বাদু রান্না হয়। 'শব দেগ' হলো এমন এক খাবার যাতে বিভিন্ন ধরনের মাংস থাকে, বিভিন্ন শাকসবজি ইত্যাদিও এতে দেওয়া হয় এবং সারারাত ধরে রান্না করা হয়। হযরত সাহেব (আ.) আমাকে ডাকেন এবং বলেন, শাহ সাহেব যা পছন্দ

করেন, যে পরিমাণ উপাদান চান, তার জন্য জোগাড় করে দাও। মাংস তো এখানেই পাওয়া যেত, তাই এখান থেকে নেওয়া হয়, আর শালগম বাটালা থেকে আনানো হয়। সন্ধ্যার দিকে প্রায় চারটি বড়ো হাঁড়ি চুলোয় বসিয়ে দেওয়া হয় এবং চালও সেখানকার দোকান থেকে– যেটি একটি ভালো ও বিখ্যাত দোকান ছিল– প্রায় দুই-আড়াই মণ নেওয়া হয়। আর সকালে সৈয়্যদ হুসামুদ্দীন সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী অতিথিদের খাবার খাওয়ানো হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, একবার জলসা সালানার সময় খরচ ফুরিয়ে যায়। সে যুগে জলসা সালানার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠানো হতো না, অর্থাৎ নিয়মিত চাঁদার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ পকেট থেকেই এর খরচ বহন করতেন। মরহুম মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) লঙ্গরের ইনচার্জ ছিলেন; তিনি একদিন এসে নিবেদন করেন, রাতের বেলা অতিথিদের জন্য কোনো রসদ নেই। অর্থাৎ খরচ ফুরিয়ে গেছে, টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেছে, মালপত্র শেষ হয়ে গেছে। এখন অতিথিদের জন্য কোনো খাবারের ব্যবস্থা নেই। হুযূর (আ.) বলেন, বিবি সাহেবার কাছ থেকে এমন কোনো অলঙ্কার নিয়ে নিন যা দিয়ে সংকুলান হতে পারে। অর্থাৎ হযরত আম্মাজানের কাছ থেকে অলঙ্কার নিয়ে নিন যা দিয়ে সংকুলান হয় বা পর্যাপ্ত হয়, তা বিক্রি করে রসদের ব্যবস্থা করে নিন। অতঃপর অলঙ্কার বিক্রি করা হয় অথবা তা বন্ধক রেখে মীর সাহেব টাকা নিয়ে আসেন এবং মেহমানদের জন্য রসদ জোগাড় করে দেন। দুদিন পর মীর সাহেব আবার রাতের বেলা আমার (অর্থাৎ মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের) উপস্থিতিতেই বলেন, আগামীকালের জন্য আবার কিছুই নেই। সেই অলঙ্কার বিক্রির টাকা দিয়ে দুদিন তো পার হয়ে গেল; এখন কী করব? তিনি (আ.) বলেন, আমরা তো বাহ্যিক উপকরণের বিবেচনায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম; আমাদের কাছে যা কিছু ছিল আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের আর দরকার নেই; তারা যাঁর অতিথি– *আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আসা লোক এরা, আল্লাহ্র অতিথি*– তিনি নিজেই এখন ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি বলেন, পরের দিন সকাল আটটা-নয়টার দিকে যখন ডাকপিয়ন আসে তখন হুযূর (আ.) মীর সাহেবকে এবং আমাকে ডাকেন। ডাকপিয়নের হাতে প্রায় দশ-পনেরোটি মানি অর্ডার ছিল যা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল। কোনো কোনোটা একশ, কোনোটা পঞ্চাশ রুপির মানি অর্ডার; আর তাতে লেখা ছিল, আমরা উপস্থিত হতে অপারগ, অতিথিদের খরচের জন্য টাকা পাঠানো হচ্ছে। তিনি (আ.) সেগুলো গ্রহণ করে 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্র ওপর ভরসা) সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, সে সময় আরও কয়েকজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি (আ.) বলেন, যেমন একজন দুনিয়াদার ব্যক্তির নিজের সিন্দুকে রাখা টাকার ওপর ভরসা থাকে যে, যখন চাইব বের করে নেব– তার চেয়েও বেশি ভরসা ওই লোকদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর থাকে, যারা আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করে। আর ঠিক এমনটিই হয় যে, যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, খোদা তা'লা সাথে সাথে পাঠিয়ে দেন। কাজেই, তিনিও (আ.) যখন বলেন, এরা আল্লাহ্ তা'লার মেহমান, তাঁরই খাতিরে এসেছে, এরপর তিনি নিশ্চয়ই দোয়াও করেছিলেন, আর তাঁর তাওয়াক্কুলও পরিপূর্ণ ছিল; ফলে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাও করে দেন।

হযরত মিয়াঁ রহমতুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (আ.) বলতেন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি একসাথে আসছে, তবুও মানুষ তওবা করছে না। তারা অনাহারে মারা যাচ্ছে।

এর তিন বছর পর দেশে মারাত্মকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে হুযূর (আ.) বলতেন, হাদীসে এর উল্লেখ আছে যে, মসীহ্ মওউদের (আ.) সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। মহানবী (সা.)-এর বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আর অন্যদিকে, মৌলভী সাহেব অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)-কে তিনি নির্দেশ দেন, যতটা সম্ভব শস্য সংগ্রহ করা হোক। তখন লঙ্গরের ব্যবস্থাপনা হুযূরের (আ.) হাতে ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। যে-সব খাদ্যশস্য ইত্যাদি ছিল, যেহেতু দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ও ভয় ছিল, তাই তিনি (আ.) বলেন, আগে খাদ্যশস্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করো। আর হযরত খলীফা আউয়ালকে (রা.) এই কাজ অর্পণ করেন, তিনি যেন সাথে সাথে সেগুলো কিনে নেন। হুযূর (আ.) মৌলভী সাহেবকে বলে দেন, আর হুযূরের (আ.) নির্দেশে মৌলভী সাহেব আমার কাছ থেকে লঙ্গরখানার জন্য ত্রিশ বস্তা (শস্য) ক্রয় করেন। চাঁদার স্বল্পতা ছিল; বাড়িতে যত অলংকার ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সবই বিক্রি করে দেন। গম কেনার জন্য তিনি মৌলভী সাহেবকে সাতশ রুপি দেন। সে যুগে সাতশ রুপি অনেক বড়ো একটি অঙ্ক ছিল। হযরত মৌলভী সাহেব (রা.) মরহুম মিয়াঁ নাজমুদ্দীন সাহেবকে (রা.) গম কেনার জন্য গ্রামে পাঠান। তিনি বলেন, তার সাথে মির্যা ইসমাঈল সাহেবও যান। শস্য কেনা হয় আর বিকানীর থেকে, যা ভারতের রাজস্থান রাজ্যের একটি অঞ্চল, সেখান থেকে মানুষজন বাস্তুচ্যুত হয়ে আমাদের এলাকায় চলে আসে। সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তাই সেখান থেকে লোকেরা চলে এসেছিল এবং চারদিক থেকে শুধু রুটির জন্য হাহাকার শোনা যেত। হুযূর (আ.) নির্দেশ দেন, লঙ্গরে যেন সারাক্ষণ আটা প্রস্তুত থাকে এবং রুটি তৈরি থাকে। তিনি মিয়াঁ নাজমুদ্দীন সাহেবকে (রা.) বলেন, যে-ই রুটি চাইবে তাকে যেন রুটি দেওয়া হয় এবং কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই কেনা শস্য শেষ হয়ে যায়। তখন হুযূর (আ.) একটি ভাষণ দেন, যার কথাগুলো এমন ছিল– এটি সাময়িক ব্যাপার; সব সময় এমন কুরবানী দিতেও হয় না, আর এমন পুরস্কার সব সময় পাওয়াও যায় না। এগুলো মু'মিনদের জন্য বিশেষ দিন। আল্লাহ্ তা'লা বন্ধুদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করুন। এই ভাষণের ফলে কিছু অর্থ সংগ্রহ হয় এবং বাইরে থেকেও কিছু আসে, আর শস্য কেনা হয়। মোটকথা দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে এই ধারা অব্যাহত থাকে। দুর্ভিক্ষকবলিত যারা আসত তাদেরকে সাথে সাথে খাবার দেওয়া হতো এবং হুযূর (আ.) বলতেন, আমি অমুক পত্রিকায় দেখেছি, কোনো এক দেশে এত শিশু অনাহারে মারা গেছে এবং এত মানুষ মারা গেছে। শস্য পাওয়া যাচ্ছে না; শস্য না পাওয়াটা আল্লাহ্ তা'লার এক কঠিন আযাব এবং ঐশী ক্রোধ। তিনি বার বার উল্লেখ করতেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন রহম করেন এবং অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে মিয়াঁ নাজমুদ্দীন ও মৌলভী সাহেবের কাছে শস্যের বিষয়ে জানতে চাইতেন ও আলোচনা করতেন। আজকালও পৃথিবীর কিছু দেশে এমন অবস্থা বিরাজ করছে। অত্যন্ত কঠিন অবস্থা; দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে না বা এত দাম যে, মানুষ কিনতে পারছে না, আর দারিদ্র্য ও অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, যেখানেই এমন খবর পাওয়া যায়, জামা'ত তাদের সাহায্যের জন্য অর্থ পাঠায় এবং তাদের প্রয়োজন মেটায়, আর এতে মানুষজনও নিজের অঙ্ক দান করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আরও তৌফিক দিন যেন তারা এসব গরিব এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে আরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

হযরত কাজী নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, *খলীফাতুল মসীহ্ সানীর যুগে তিনি এই বিষয়টি বর্ণনা করেন; তিনি বলেন,* খাকসার হযরত আমীরুল মু'মিনীনের সাথে– যিনি আমার সহপাঠী ছিলেন– দারুল মসীহ্‌তে রাতে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য লাভ করত। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) আমাদের পড়াতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নারীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ দিতেন। তখন তো সেসব ভাষণের শব্দ আমাদের কান পর্যন্ত ভালোভাবে পৌঁছাত, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তার কিছুই এখন মনে নেই। লঙ্গরের আটার জন্য সাধারণত মোল্লা আহমদ নূর যেতেন এবং গাধার পিঠে করে যখন আটা আনা হতো, তখন আল্লাহ্ তা'লা খাকসারকেও আটার বস্তা উঠিয়ে দারুল মসীহ্‌তে পৌঁছে দেবার সুযোগ দান করতেন। তিনি বলেন, আমি একবার হুযূর (আ.)-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জামার আঁচলে করে অনেক রুপি নিয়ে আসেন এবং না গুনেই মোল্লা আহমদ নূরের আঁচলে তা ঢেলে দেন। তিনি না গুনেই টাকা দিয়ে দেন যে, যাও, যেহেতু লঙ্গরখানার বিষয়াদি পরিচালনা করতে হবে, আরও জিনিসপত্র কিনে আনো যেন লঙ্গরের ব্যবস্থাপনা চলতে থাকে।

হযরত মিয়াঁ চেরাগ দীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবারের ঘটনা, আমার গলা এমনভাবে বন্ধ হয় যে, আওয়াজ বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবকে বলেন, চেরাগের গলার চিকিৎসা করুন। কী কারণে তার আওয়াজ বের হচ্ছে না? হযরত মৌলবী সাহেব চিকিৎসা করতে থাকেন, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। তারপর এক উপলক্ষ্যে ডা. মুহাম্মদ হুসাইন শাহ সাহেব, ডা. ইয়াকুব বেগ সাহেব এবং লাহোরের ডা. বুঢ়ে খান সাহেব যখন একত্রিত হন, তখন তাদের সামনেও হুযূর এই বিষয়টি উল্লেখ করেন যে, কী কারণে ছেলেটির আওয়াজ বন্ধ হয়ে আছে। এর প্রেক্ষিতে ডা. ইয়াকুব বেগ সাহেব আমার গলা দেখে বলেন, হুযূর যদি নির্দেশ দেন তবে এর গলা ভেতর থেকে কেটে ফেলা হোক; অর্থাৎ মনে হচ্ছে টনসিলের কারণে এমনটি হয়েছে এবং এমনটি করলে কণ্ঠ খুলে যাবে। হুযূর (আ.) এর উত্তরে কিছুই বলেন নি এবং চুপ থাকেন। তিনি বলেন, এরপর কয়েকদিন পর হুযূর বলেন, চেরাগ, এখন আমি তোমার চিকিৎসা করব। আর তিনি তখনই দেখে বলেন, আমি তোমার জন্য ব্যবস্থাপত্র তৈরি করব। খোদার প্রজ্ঞার কী মাহাত্ম্য! সেদিনই অমৃতসরের এক ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা আকন্দ পাতার আচারের একটি বয়াম নিয়ে আসে। হুযূর তা খুলে দেখেন এবং বলেন, এটিই তোমার চিকিৎসা। *তিনি যে পূর্বে বলেছিলেন ব্যবস্থাপত্র তৈরি করবেন, এরপর ঠিক সেরকমই ব্যবস্থাপত্র তৈরিকারী বা আচার জাতীয় জিনিস তৈরিকারী একজন, যে হেকিমির কাজও করত, সে আকন্দ পাতার সেই আচার নিয়ে আসে; তখন হুযূর (আ.) বলেন, এটিই তোমার চিকিৎসা।* খাওয়ার সময় রুটির ওপর দুই-তিনটি পাতা রেখে আমাকে দিয়ে দিতেন। সেটি খুবই মজাদার ছিল এবং হুযূর নিজেও তা চেখে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, এতে আমার রোগ প্রশমিত হয়। এর প্রেক্ষিতে হুযূর পুরো বয়ামটিই আমাকে দিয়ে দেন যেন আমি তা খাই। সুতরাং আমি তা খাই এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই।

হযরত মির্যা আফযাল বেগ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি কাদিয়ানে প্রথমবার ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আসি। *এখানে পিতা-পুত্র উভয়ের নামই আফযাল বেগ লেখা হয়েছে; মনে হচ্ছে নাম ভুল হয়েছে।* যাহোক তিনি বলেন, আমার পিতা যিনি আদালতের মোক্তার ছিলেন, শিক্ষা অর্জনের জন্য আমাকে তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন, বোর্ডিংয়ে আরও কয়েকজন ছাত্র ছিল। সেসময় বোর্ডিংয়ের ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা লঙ্গরের

খাবারের সাথেই ছিল। খাবার সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ দেখা দিলে আমার পিতা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে উল্লেখ করেন, বাচ্চাদের খাবারের কষ্ট হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে হুযূর অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে বলেন, বাচ্চারা এখন থেকে বাড়ি থেকে খাবার পাবে। আর এভাবেই কয়েক মাস পর্যন্ত হুযূরের নিজের ঘর থেকে আমাদের কাছে খাবার আসতে থাকে এবং মাঝে মাঝে হুযূর ঘর থেকে আম ও মিষ্টি ইত্যাদিও খাওয়ার জন্য পাঠাতেন।

খাজা আব্দুর রহমান কাশ্মীরী সাহেব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে জানান, মরহুম হাফেয হামেদ আলী সাহেব তার কাছে বর্ণনা করেছেন, যখন হুযূরের কাছে কোনো জায়গা থেকে টাকা আসত, তখন হুযূর আমাকে ডেকে নিতেন এবং না গুনেই টাকা দিয়ে দিতেন আর বলতেন, এখন টাকা নিয়ে নাও, কে জানে আবার কবে হাতে আসবে! খাকসার নিবেদন করে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, মরহুম হাফেয হামেদ আলী সাহেব হযরত সাহেবের বিশেষ সেবক ছিলেন, যাকে হযরত সাহেব ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য টাকা দিতেন।

হযরত খান সাহেব সৈয়দ গোলাম হুসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর আমাকে কাদিয়ান থেকে পাঠালেন ও বললেন, বাটালা থেকে রেলের একটি পার্সেল এসেছে; সেটি নিয়ে আসো। আর তিনি আমাকে পাঁচ রুপিও দেন। *ট্রেনে করে পার্সেল এসেছে; সেটি বাটালা থেকে নিয়ে আসো।* পার্সেলটি ছিল আঙুরের একটি ঝুড়ি, যার জন্য মাত্র চার আনা খরচ লেগেছিল। আমি যখন সেই ঝুড়িটি এনে উপস্থিত করি তখন হুযূর ঝুড়ির চট ছিঁড়ে দুই হাতে আঙুর বের করে প্রথমে আমাকে দেন আর বলেন, এটি আপনার অংশ। আমি অবশিষ্ট পৌনে পাঁচ রুপি ফেরত দিতে চাইলাম, তখন হুযূর একথা বলে ঝুড়িটি উঠিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন যে, আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে হিসাব রাখি না। তিনি বলেন, সেসময় আমার বয়স পনেরো বছর ছিল।

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং খাজা কামালুদ্দীন সাহেব পেশোয়ারে একত্রে ওকালতি করতেন। দুইজন অংশীদার ছিলেন, *অর্থাৎ তাদের যৌথ আইন ব্যাবসা ছিল।* মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব কাদিয়ানে চলে আসেন, তবে খাজা সাহেব সেখানেই থেকে যান। হযরত সাহেবের (আ.) ওপর যে মামলাগুলো ছিল– সম্ভবত তা করম দীনের মামলার বিষয় হবে– সেগুলোর তদারকির জন্য খাজা সাহেব পেশোয়ার থেকে আসেন। হযরত আকদাস (আ.) মসজিদে মুবারকে আসেন। খাজা সাহেব একেবারে কান্না-কান্না চেহারায় নিবেদন করেন, হুযূর! আল্লাহ্ এবং রসূলই জানেন, আমি কীভাবে এখানে পৌঁছেছি! স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে ভাড়ার জন্য টাকা জোগাড় করে আমি এখান পর্যন্ত পৌঁছেছি। আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। হযরত সাহেব বলেন, খাজা সাহেব, আপনার কি টাকা প্রয়োজন? আসুন! এরপর হযরত সাহেব ভেতরে যান এবং খাজা সাহেবও সাথে যান। তিনি একটি ট্রাংক খোলেন; তাতে সম্ভবত কয়েন ছিল; তিনি (আ.) হাত ভরে দুই-তিন আঁজলা খাজা সাহেবের ঝুলিতে ঢেলে দেন এবং বলেন, খাজা সাহেব, এতটুকু যথেষ্ট নাকি আরও প্রয়োজন? খাজা সাহেব বলেন, যথেষ্ট হুযূর! এখন তো অনেক হয়ে গেছে। খাজা সাহেব পরবর্তীতে মসজিদে মুবারকে সেই টাকাগুলো গুনে দেখেন– তা প্রায় তিনশ রুপি ছিল। খাজা সাহেব পরদিন গুরুদাসপুর চলে যান। হযরত সাহেব সেই টাকা না গুনেই তাঁর ঝুলিতে ঢেলেছিলেন এবং হযরত সাহেবের এটি সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তিনি খাদেমদেরকেও টাকা গুনে দিতেন না, পূর্ণ আস্থা ও

বিশ্বাস রাখতেন। যতটুকু সময় আমার থাকার সুযোগ হয়েছে, হযরত সাহেব কখনো কোনো খাদেমের কাছ থেকে হিসেব চান নি; বরং যখনই কেউ চাইত, হযরত সাহেব তাকে দিয়ে দিতেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব খাজা সাহেবের প্রতি স্নেহের এই উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, খাজা কামালুদ্দীন সাহেব, যিনি আজ জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, অর্থাৎ জামা'ত থেকে আলাদা হয়ে গেছেন এবং অনুগ্রহকারী পিতার সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেন; *অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন আর তাঁর সন্তান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর সাথে তার শত্রুতা রয়েছে;* তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃপা, অনুগ্রহ এবং দানশীলতার ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃপার তো তার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি অসংখ্যবার টাকা নিয়েছেন এবং নেবার পরও কখনো স্বীকার করেন নি, কখনো নেবার পরও কাউকে জানান নি কিংবা অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন নি, বরং নিজের সেবার বড়াই করতে থেকেছেন। বরাবর এটাই বলেছেন যে, আমি জামা'তের অনেক বড়ো সেবা করছি। তিনি লেখেন, আমি একে উপকারকারীর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ অস্বীকার করা বলে মনে করি। গুরুদাসপুরে যখন মৌলভী করম দীনের মামলাগুলো চলছিল, তখন একবার মামলা চলাকালীন তিনি হুযূরকে (আ.) একটি চিঠি দেখান যা তার বাড়ি পেশোয়ার থেকে এসেছিল এবং তাতে খরচের সংকটের কথা উল্লেখ ছিল। হুযূর (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে তাকে নগদ পাঁচশ রুপি দিয়ে দেন এবং তিনি বলেন, এরপর মাসিক একশ রুপি দিতে থাকেন। অর্থাৎ এরপর তিনি (আ.) মাসিক একশ রুপি করে দিতে থাকেন। বিশেষভাবে বন্ধুগণ হুযূরের (আ.) আহ্বানে মামলার খরচের জন্য অনেক বড়ো অঙ্কের টাকা পাঠিয়েছিলেন যা খাজা সাহেবের কাছে থাকত। হযরত সাহেব কখনো হিসাব চান নি। এ ধরনের আর্থিক সদাচরণ এবং দান ছাড়াও হযরত সাহেবযাদা শহীদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য একটি মূল্যবান কোট নিয়ে এসেছিলেন যা আফগানি ধাঁচের ছিল। খাজা সাহেব একথা বলে তা চেয়ে নেন যে, হুযূর, এই কোটটি আমাকে প্রদান করুন যেন আমি এটি পরে আদালতে প্রবেশ করতে পারি এবং এর বরকতে বিরোধী পক্ষের উকিল এবং আদালতে আমার প্রভাব থাকে। হুযূর হেসে এই কারুকাজ করা মূল্যবান চোগাটি খাজা সাহেবকে দিয়ে দেন। গত খুতবাতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি উন্নতমানের চামড়ার তৈরি একটি কোট এনেছিলেন। আজকালও লেদারের যে-সব পোশাক রয়েছে সেগুলো অনেক মূল্যবান মনে করা হয়, সে যুগেও তা-ই ছিল। সেই কোটটিও তিনি খাজা সাহেবের চাওয়ার পর তাকে দিয়ে দেন।

শেখ হামেদ আলী সাহেব বর্ণনা করেন, শেষ বয়স পর্যন্ত আমার কাছে কখনও হিসাব চান নি এবং কখনও অসন্তুষ্টও হন নি। বরং একবার আমি লাহোর যাই; মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব সাতশ রুপির হুন্ডি পাঠিয়েছিলেন, আমি তা নিয়ে আসি। টাকা ছিল, কোনো মানি অর্ডার বা ভাউচার জাতীয় কিছু ছিল। কিছু জিনিসপত্র আনি, মালপত্রও কিনি। প্রায় পঞ্চাশ রুপি ফেরত আনি। মালপত্র কেনার পর তা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আমি এর হিসাব হযরত সাহেবকে দেই। তিনি বলেন, আমি কবে হিসাব চেয়েছি?

হযরত শেখ আহমদ দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই অধমকে নির্দেশ দেন, তুমি অমৃতসরে মিয়াঁ নবী বখশ সাহেব রফুগরের কাছে যাও;

আর সাথে একটি চিঠি লিখে দিয়ে বলেন, এটি তাকে দিয়ে দিও। তিনি যে-সব জিনিস কিনে দেবেন তা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে এবং আগামীকালের মাঝে ফিরে আসবে। পরের দিন আমি কিছুটা দেরিতে পৌঁছি। হুযূরের একজন সেবক ছিলেন মিয়াঁ করমদাদ সাহেব। তিনি (আ.) তাকে নির্দেশ দেন, তাড়াতাড়ি যাও; আহমদ দ্বীনকে অমৃতসরে পাঠিয়েছিলাম, সে এখনও ফিরে আসে নি; সব ঠিক আছে কি না খোঁজ নাও। রাস্তায় মিয়াঁ করমদাদ সাহেব আমাকে পেয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন, হযরত সাহেব তোমার জন্য অনেক চিন্তা করছেন। আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে পৌঁছি, তখন শুরুতেই হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোনো কষ্ট হয় নি তো? আমি নিবেদন করি, হুযূর, কোনো কষ্ট হয় নি। এভাবে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করায় আমার মন আনন্দে ভরে যায় যে, তিনি আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি একটি হিসাবের কাগজ এবং কিছু টাকা ফেরত দিতে চাইলে হুযূর (আ.) বলেন, এটি কীসের কাগজ? আমি বিনম্রতার সাথে নিবেদন করি, এই জিনিসগুলোর হিসাব এবং এই টাকাগুলো বাকি আছে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে তিনি (আ.) বলেন, আমার আর তোমার আবার কীসের হিসাব! এই টাকাগুলো তুমি তোমার প্রয়োজনে খরচ কোরো। আমি অনেক খুশি হই।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লেখেন, হযরত হাকীমুল উম্মত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব একবার তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার নিয়েছিলেন। যখন তিনি সেই টাকা হযরতের সমীপে ফেরত পাঠান, তখন হুযূর (আ.) তা অপছন্দ করেন এবং তা ফেরত দিয়ে বলেন, আপনি আমার টাকাকে আপনার টাকা থেকে আলাদা মনে করেন?

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবই লেখেন, হযরত আকদাস যখন থেকে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হবার ঘোষণা দিয়েছেন এবং মানুষ এটিও জানতে পেরেছে যে, খোদা তা'লা তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছেন– 'বাদশাগণ তোমার কাপড় থেকে বরকত খুঁজবে'– তখন মানুষ সাধারণত তাঁর কাছে কাপড় চাইত এবং তিনি কখনও কাউকে প্রত্যাখ্যান করতেন না। আর মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হতো যে, কেবল তাঁর শরীরে থাকা কাপড়গুলোই অবশিষ্ট থাকত এবং বাকি সব দিয়ে দেওয়া হতো।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বলেন, মীর আব্বাস আলী সাহেবের কাছে বারাহীনে আহমদীয়ার যে মূল্য আসত, তা তাকে খরচ করার অনুমতি তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। এটি প্রশস্ত হৃদয় এবং দানশীলতার একটি সাধারণ প্রমাণ। হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেব এবং মির্যা ইমামুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরম বিরোধী ছিলেন; *অনেক বিরোধী ছিলেন, তারা দুইজন আত্মীয়ও ছিলেন কিন্তু বিরোধী ছিলেন;* তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় তারা যখনই কোনো কিছু চাইতেন, হুযূর তা পূর্ণ করে দিতেন। তিনি বলেন, একবার আমার সামনে মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেব হুযূরের কাছে পঞ্চাশ রুপি বা কমবেশি কিছু চেয়েছিলেন এবং হুযূর সাথে সাথে হাফেয হামেদ আলীর হাতে তা পাঠিয়ে দেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন, আরবের আব্দুল মুহয়ী সাহেব একদিন আমার কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগের কথা উল্লেখ করে বলেন, হযরত সাহেবের দানশীলতার কথা আর কী বলব! অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতার কথা আর কী বলার আছে! তিনি বলেন, তাঁর যুগে আমার কখনও কোনো কষ্ট হয় নি। যখন যে জিনিসের প্রয়োজন হতো, কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই চেয়ে নিতাম এবং হুযূর আমার

প্রয়োজনের চেয়েও বেশি দিতেন আর নিজে থেকেও প্রতিনিয়ত দিতে থাকতেন। হুযূরের যখন ওফাত হয়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার প্রয়োজন সেভাবে মেটাতে পারেন নি, যদিও তিনি নিজেও অনেক দানশীল হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমি তাঁকে লিখি, আপনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খলীফা তো হয়ে গেছেন, কিন্তু আমার প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন নি। হযরত সাহেব তো আমার সাথে এমন আচরণ করতেন। এর প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি বলেন, তবে খোদার কসম! কোথায় হযরত সাহেব আর কোথায় তিনি! তাঁর (আ.) তুলনায় তিনি (রা.) কিছুই নন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরে কোনো এক গরিব নারী কিছু চাল চুরি করে। লোকজন তাকে দেখে ফেলে এবং হইচই আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন নিজের কক্ষে কাজ করছিলেন। শোরগোল শুনে বাইরে আসেন এবং এই দৃশ্য দেখতে পান যে, দুর্দশাগ্রস্ত এক গরিব নারী দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে চালের একটি ছোটো পুঁটলি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘটনা জানতে পারেন এবং সেই গরিব নারীর চেহারা ও অবস্থা দেখে তাঁর মন গলে যায়। তিনি বলেন, একে দেখে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মনে হচ্ছে। একে কিছু চাল দিয়ে বিদায় করে দাও; *অর্থাৎ আরও দিয়ে দাও* এবং খোদা তা'লার সাত্তার তথা দোষত্রুটি গোপন রাখার গুণ অবলম্বন করো। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করে লেখেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনো ত্বরাপরায়ণ ব্যক্তি বলতে পারে, এই বিষয়টি তো চোরকে চুরি করতে আরও দুঃসাহসী করে তুলবে। *অর্থাৎ একজন চুরি করেছে, তাকে তিনি আরও দুঃসাহসী করে তুলছেন।* কিন্তু জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবে, জিনিস যেহেতু স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজস্ব ছিল এবং তা নিয়েছিল ক্ষুধার্ত, অনাহারে মৃতপ্রায় হতদরিদ্র একজন নারী, সেহেতু এটি চুরি করাকে সহায়তা-সমর্থন প্রদান নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে এটি দরিদ্রকে আহার প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসসমূহ থেকে সাব্যস্ত হয়, মহানবী (সা.)-ও এরূপ পরিস্থিতিতে– যদি চোর নিতান্ত দরিদ্র হয় ও চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোনো খাদ্যবস্তু নিয়ে ফেলে– তবে তাকে চোর হিসেবে গণ্য করেন নি, বরং তা উপেক্ষা করেছেন। এ হলো নিজ মনিবের [তথা মহানবী (সা.)-এর] পরিপূর্ণ অনুসরণের দৃষ্টান্ত! আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আবদিকাল মসীহিল মওউদি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। [হে আল্লাহ্! আশিস বর্ষণ করো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তোমার দাস মসীহ্ মওউদের প্রতিও এবং (তাদের ওপর) কৃপা ও শান্তিও বর্ষণ করো।]

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)